সিকিম ও দার্জিলিং-এর লুপ্তপ্রায় জনজাতি : লেপচা

হরেন ঘোষ

সিকিম ও দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক লেপচা বসবাস করে। এক একটি গ্রামের প্রতিটি পরিবারই লেপচা। এদের বাসভূমি এই অঞ্চল। কিন্তু বর্তমানে নিজভূমে পরবাসী এরা। কারণ, নেপালি ভাষাভাষীরা ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করে লেপচাদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটাচ্ছে। তবুও এখনও বহু পর্বতশৃঙ্গে লেপচারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সমবেতভাবে বসবাস করে।

লেপচাদের স্বভাব অত্যন্ত সহজ-সরল, শান্ত। এরা কখনও কোনও ঝগড়া-ঝামেলায় যেতে চায় না। সব দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনা সহ্য করেও হাসিমুখে নাচ-গানের মাধ্যমে সময় কাটায়। এরা অত্যন্ত অতিথিবৎসল। নিজেদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও অতিথি সেবায় সদা উন্মুখ। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গাভি, শূকর, ছাগল এবং মুরগি পোষা হয়।

এদের বসবাসের অঞ্চলে জমি অনুর্বর। প্রচণ্ড জলাভাব। সার একমাত্র গোবর। মূলত এরা কৃষিজীবী। এরা জমিতে আদা, আলু, সয়াবিন, নানাবিধ ও সবজি ফলায়। আর আছে কমলা বাগান। নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিয়ে বাকিটা বিক্রি করে সংসার চালায়। এরা প্রকৃতি প্রেমিক। বৃক্ষছেদন করে না। গাছ, মাটি, নদী, পাহাড়, সূর্য এদের আরাধ্য দেবতা। পুরোহিতের নাম 'বমথিং' এবং 'মুন'। ধর্মগ্রন্থের নাম 'নামাথার'। প্রধান খাদ্য কোদো। সরষের দানার মতো শস্য। কোদোর ভাত এবং রুটি হয়। তবে সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য মাংস। এরা বাস করে মূলত পর্বতশীর্ষে। কিংবা পর্বত পাদদেশে নদীর ধারে। বিরাট সংখ্যক লেপচা মৎস্যজীবী। মাছ মেরে নিজেরা খায় এবং বিক্রি করে। প্রথম দিকে এরা ছিল অরণ্যবাসী। শিকার করতে ভালোবাসে। পরবর্তীকালে চাষবাস শুরু করে।

লেপচারা এই অঞ্চলের আদি অধিবাসী হলেও, সবদিক দিয়ে নিজেদের বঞ্চিত মনে করে। এদের মতে আদমশুমারিতে জনসংখ্যা কম দেখান হয়। এদের শিক্ষার প্রতি সরকারের দৃষ্টি নেই। জীবনের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও সজাগ নয় সরকার। প্রাথমিক স্তরেও নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। অথচ এদের নিজস্ব লিপি আছে। নিজেদের দোষ দেয় এরা। ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদা দেবার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেনি সঙ্ঘবদ্ধভাবে।

লেপচাদের বক্তব্য, চা-বাগান, রেল ও সেনা বিভাগে যোগ দেবার জন্য নেপাল থেকে প্রচুর লোক এসে এদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করেছে, এদের ভূমিহীন করেছে। তাই এরা সবদিক দিয়ে বঞ্চিত ও অবহেলিত। যেহেতু এরা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় জাতি, কোনও আন্দোলন করতে পারেনি।

এরপর আছে বিবাহ। মিশ্র বিবাহের ফলে স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হচ্ছে। ভাষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেপালিরা অনেক উন্নত এবং আধুনিক। তাই অনায়াসে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হয়েছে।

এদের বক্তব্য, সিকিমে লেপচারা যে সুযোগ-সুবিধা পায়, তার কণামাত্র দার্জিলিং-এ এরা পায় না। সেখানে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেপচা ভাষায় শিক্ষার সুযোগ আছে। দার্জিলিং জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল রিমবিকে গেলে দেখা যায় রম্মাম ঝরনার ওপারে সিকিমের জনবসতি। ওদিকে লেপচা গ্রামবস্তি। সিকিমে প্রতিটি বাড়িতে টিনের চাল, খেতে জল দেবার সুব্যবস্থা, ঝকঝকে পথঘাট, জলবাহী পানীয় জল। বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুতালোক। এপারে এসবের ব্যবস্থা নেই। দোষ দেয় এরা নিজেদেরই। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আছে, টাকা পায়, কিন্তু কাজ হয় না। সরকারের চেয়েও বেশি দোষ কর্মকর্তাদের। যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা কাজ করে না। সমাজসেবার চাইতে আত্মসেবা, পরিজন সেবাতেই এদের আগ্রহ বেশি।

ক্রমশ একটি জাতি নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এদের ক্ষোভ, কোনও সরকারি কাজ এরা পায় না। অধিকাংশই কৃষিজীবী। পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পায় না।

লেপচাদের মধ্যে এখনও অনেক আছেন যাঁরা ভেষজ বিজ্ঞানী বা কবিরাজ। ছোটখাটো অসুখ থেকে দুরারোগ্য রোগ সারাতে পারেন ভেষজের সাহায্যে। কুকুর কামড়ালে বা সাপে কাটলেও এরা সারাতে পারেন বলে দাবি করেন। তবে এরা পারিবারিক সূত্রে এই জ্ঞান ধরে রাখেন। অন্য কাউকে শেখান না। তবে এদের দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে। যেভাবে অরণ্য নিধন হচ্ছে তাতে ভেষজ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন জাগছে, যারা লেখাপড়া শিখছে, গ্রাম ছেড়ে শহরে আসছে, তারা আধুনিক জীবনের প্রতি আগ্রহান্বিত হচ্ছে। প্রাচীন রীতিনীতি সংস্কার এরা মেনে নেবে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। নেপালিদের আধিপত্যে যেমন ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, তেমনিভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারা এবং নেপালি সামাজিক রীতিনীতি অভ্যাস এদের ক্রমশ গ্রাস করছে। এদের মধ্যেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে।

লেপচারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকতে ভালোবাসে। মনে হয় গ্রামাঞ্চলের সকলেই এক পরিবারভুক্ত। যারা কিছুটা স্বচ্ছল তারা অন্যদের সাহায্য করে। ধনবানরা দরিদ্রদের অবহেলা বা ঘৃণা করে না। উপরন্তু যে কোনও সময় বাড়িতে কেউ এলে তারা খাওয়া-দাওয়া করে যায়। কোনও নিমন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না।

অবসর সময়ে এরা নাচগানে মেতে থাকে। সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যা হতে রাত পর্যন্ত ছোট-বড় সকলেই নাচগানের মাধ্যমে আনন্দোৎসবে মেতে থাকে। এখানেও কোনও ভেদাভেদ নেই।

লেপচাদের অধিকাংশের বাড়িতে প্রথম ঘরটি অতিথিদের জন্যে রাখে। সকলের বাড়িতে একটি করে ঠাকুরঘর আছে। বুদ্ধ মূর্তির কাছে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। সন্ধ্যায় ধূপ জ্বালায়, মন্ত্রপাঠ করে।

লেপচাদের বাড়ি তৈরি হয় অভিনব প্রক্রিয়ায়। পাথরের ওপর বাঁশ-বেত বা কাঠের বাড়ি। এদের নিজস্ব বাড়ির নাম 'লি'। এখন প্রায় দেখাই যায় না।

লেপচা সমাজ ও জীবন সম্পর্কে গবেষণা করলে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা যায়। এরা প্রাচীনতম জনগোষ্ঠীর অন্যতম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় ক্রমশ এরা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অন্য ভাষাভাষী, রীতিনীতির ভিন্ন সমাজের সংমিশ্রণে। তবু এরা অনেকে চেষ্টা করছে প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে।

লেপচা কাদের বলা হয়? তাদের আদি নিবাস কোথায়? এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। বিশেষষভাবে সমাজবিজ্ঞানীদের মনে এই প্রশ্ন জাগে। লেপচাদের সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছেন কিন্তু সর্বার্থে সার্থক হননি। অধিকাংশ তথ্যই অনুমান নির্ভর। কারণ কোনও লিখিত তথ্য পাওয়া যায়নি এবং অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য সূত্রই তিব্বতীয়রা ধ্বংস করেছে। সেজন্যে লোককথা, লোকসাহিত্য এবং প্রচলিত কাহিনির ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে।

সিকিমের আদিম অধিবাসী লেপচা। এই অঞ্চলকে বলা হয় 'Ne Manjel Ronjyong Lyang' অর্থাৎ পবিত্রভূমি। যেখানে অসীম পবিত্রতা বিরাজমান। যদিও এদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে তথাপি নিজস্ব সংস্কৃতি লোকাচার সযত্নে রক্ষা করে চলে। সিকিম ও দার্জিলিং-এ এদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। তিন শতাব্দী আগে তিব্বতীয়দের সঙ্গে এদের প্রথম সংঘাত হয়। পরবর্তীকালে নেপালিদের সঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গের তপশিল তালিকাভুক্ত ৩৮টি আদিবাসীদের মধ্যে লেপচা অন্যতম। সিকিমেও তাই। বর্তমানে সিকিম গঠনের আগে সিকিমের আয়তন অনেক বড় ছিল। দীর্ঘদিন তারা বস্তুত লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। সমাজবিজ্ঞানীরাও তাদের দিকে দৃষ্টি দেননি। ভাষাগত বিভাজন, পেশাগত বিভাজনের ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

যখন ইউরোপীয়রা প্রথম গভীর অরণ্যাঞ্চলে অভিযান শুরু করে তখন তাদের আবিষ্কার করা হয়। তিব্বতীয়রাই প্রথম তাদের অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। আজ আমরা লেপচাদের সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারি তা একমাত্র ইউরোপীয় পর্যটক ও সাংবাদিকদের দৌলতে।

General G.B. Man Wring একজন লেপচা রমণীকে বিবাহ করেন এবং দীর্ঘকাল এদের সঙ্গে বসবাস করেন। তিনি লিখেছেন লেপচা জাতি এবং প্রথাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া বর্বরোচিত এবং দুঃখজনক কাজ হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি।

লেপচা শব্দটি কীভাবে এল? এরা নিজেদের লেপচা বলে না, বলে 'রঙ' বা 'Mutanchi Rong', Mamwaring বলেছেন এই নাম গুর্খাদের দেওয়া। নেপালে এক নিরীহ গোষ্ঠী বাস করে যার নাম 'লেপচা'। এদের শান্ত প্রকৃতির জন্য এই নাম। Warddel বলেছেন ইউরোপীয়রা এই নাম দিয়েছে। লিম্বুরা অন্য অর্থ করে। তারা বলে শ্বশুরমশাইয়ের নির্দেশে শূকরের বদলে জামাই মুরগি এনেছিল। তাই তাচ্ছিল্যভরে

তাকে বলা হয়—লাপচে। অর্থাৎ পালকে ঢাকা হস্তবিশেষ। লাপচে প্রশংসাসূচক না ঘৃণাসূচক তা বলা কঠিন।

অনেক বলেন—লেপচারা প্রকৃতিপূজক। পাশ্চাত্যকে এরা বলে 'লাপচো'। লাপচো উপাসনার স্থান বা বিশ্রামস্থল। তাই এখানে যারা থাকে তাদের নেপালিরা নামকরণ করে 'লাপচে'।

জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ G.B. Mamwarning বলেছেন লেপচা ভাষা হিব্রু এবং সংস্কৃতের থেকেও প্রাচীন। মনে হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। তাই মনে করা হয় ভাষার চাইতেও এখানকার মানুষেরা প্রাচীন।

অনেক লেখক তিব্বতি ভাষার সঙ্গে লেপচা ভাষার সামঞ্জস্য লক্ষ করেছেন। অনেকে বলেন চৈনিক ভাষার সঙ্গেও মিল আছে। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে এদের ভাষার সঙ্গে নাগা ভাষার মিল আছে।

Dorji Khangsanpa-র মতে লেপচাদের যথার্থ ইতিহাস জানার উপায় নেই। কোনও তথ্য রাখে নি। সেজন্য বলা যায় না এরা কোথা থেকে এসেছে। তাদের বসবাসের ধরন, শিকারের পদ্ধতি এবং চাষবাসের ধরন অনেকটাই নাগাদের মতো।

পারসমনি প্রধান তিন দশক লেপচাদের নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর মতে এদের আদিভূমি চিন। পরবর্তী সময়ে এরা দক্ষিণে নেমে আসে। প্রথমে আসামের দক্ষিণে থাকে। তারপর পশ্চিমে অগ্রসর হয় এবং বর্তমান স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করে। যারা ওই অঞ্চলে থেকে যায় তাদের বলা হয় 'Mishingis'।

লেপচা অন্যতম বৈজ্ঞানিক ভাষা। এই অঞ্চলের স্থান নাম, পাহাড়ের এবং নদীর নামকরণ লেপচা ভাষায় হয়েছে। নামকরণের অভিনবত্বে বিস্মিত করে। আরণ্যক জীবন এবং জন্তুর নামকরণে প্রথম অক্ষর 'S' এবং সমস্ত নদীর নামের আদ্যক্ষর 'R' ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ :

Rivers of Sikkim

Runyoo - Teesta
Rungit - Rangit
Rushi - Risshi
Rivers of Darjeeling
Ruli - Relli
Rumbik - Rimbik
Rummul - Mahanadi

K.P. Tamsong বলেছেন—লেপচা ভাষা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষা। সর্বাধিক উন্নত এবং সুললিত ভাষা। যে কোনও লতা, গুল্ম, বৃক্ষ, পোকামাকড়, জীবজন্তুর নামকরণ

আছে। জ্যোতিষবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নামকরণ পাওয়া যায়।

স্থান নামের ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্য লক্ষনীয়। Darjeeling - 'Darjyo-lyang' অর্থাৎ দেবদেবীর আবাসস্থল। লেপচা শব্দ Kur-song বর্তমানে Kurseong। যার অর্থ Orchid। 'Kalohym-bong' একপ্রকার বৃক্ষের নাম। যা থেকে এসেছে Kalimpong।

লেপচারা অনেকটা যাযাবর প্রকৃতির। খাদ্যের অন্বেষণে স্থান হতে স্থানান্তরে যাতায়াত করত। বর্তমানে চাষাবাদ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে এক একটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। শহরে চাইতে গ্রামাঞ্চলে থাকাই পছন্দ করে। তিন হাজার থেকে ছয় হাজার ফুট উচ্চতায় এরা বসবাস করা পছন্দ করে।

লেপচা লোকসংখ্যা—১৯০১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত—

সাল	জনসংখ্যা
১৯০১	১০,০৫২
১৯১১	৯,৮৪২
১৯২১	৯,৬৬৯
১৯৩১	১২,৭১৯
১৯৪১	১২,৪৬৮
১৯৫১	১৩,৪৩০
১৯৬১	১৮,৯১০
১৯৭১	১৪,৫৬৮

পরিসংখ্যান এ আসল তথ্য জানা যায় না। এদের মতে একমাত্র দার্জিলিং জেলাতেই ৩০,০০০ লেপচা বাস করে। এদের জন্মহার বাড়ছে। মৃত্যুহার অন্য সম্প্রদায় থেকে বেশি নয়। শিশু মৃত্যুর হার খুব কম। এরা ভেষজ ওষুধে দক্ষ। সর্পাঘাতে বা পাগলা কুকুরের কামড়ে এরা মারা যায় না।

ধর্মগতভাবে এরা হয় বৌদ্ধ নয় খ্রিস্টান। কালিম্পং মহকুমায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এদের সংখ্যা বেশি।

১৯৭১ সালে কালিম্পং-এর নেপালি ভাষা প্রকাশনী সমিতি এক নির্দেশ জারি করে যাতে সমগ্র অঞ্চলের অধিবাসী তাদের মাতৃভাষা 'নেপালি' লেখে। লেপচারা সচেতন হয়। কিন্তু নেপালি ভাষী জনগণকারীরা 'লেপচার' স্থলে 'নেপালি' বসিয়ে দেয়। গ্রামাঞ্চলে এটি বেশি হয়।

প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। লেপচাদের সংস্কৃতি অনেকাংশ তিব্বতি সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সিকিমে যেহেতু রাজা তিব্বতীয় বংশোদ্ভূত সেখানে তাদের প্রভাব বেশি। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লেপচাদের নিজস্ব লোকাচার, জাতিগত সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ইউরোপীয় আগমনে তাদের ওপর প্রচন্ড ধাক্কা লাগে। পার্শ্ববর্তী নেপাল থেকেও দলে দলে লোক চলে আসে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এইভাবে ক্রমশ লেপাচারা

কোণঠাসা হয়ে পড়ে। লেপচা জাতি ও ভাষার সঙ্কট উৎপন্ন হয় অত্যাচার ও চাপের জন্য। অনেক লেপচারা ভুটিয়াদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। তারা নিজেদের ভুটিয়া আখ্যা দেয়। Dzongu অঞ্চলে সংখ্যাধিক্য থাকায় নিজস্ব সংস্কৃতি রাখতে পেরেছে। যদিও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশি তবুও মন ও বংথিং-এর ধারা অব্যাহত। দার্জিলিং-এ খ্রিস্টান মিশনারিদের জন্য লেপচাদের ওপর আঘাত বেশি হয়েছে। ইংরেজরা আসার আগে তিব্বতীয় ও ভুটানিরা বৌদ্ধধর্মের প্রচার করে এদের মধ্যে। সামান্য সংখ্যক গোঁড়া পরিবার ছাড়া প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। লামাদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুমফা তৈরি হয়। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম এত জনপ্রিয় হয় যে লেপচারা মনে করতে থাকে এটিই তাদের মূল ধর্ম। এর ফলে লেপচা গুমফাও দেখা যায়। (সাধারণ ভাগ হল : লেপচা গুমফা, ভুটিয়া গুমফা, তামাং গুমফা।) ক্রমশ তিব্বতি সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে এবং লেপচা সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে থাকে। লামাদের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং তিব্বতি ভাষাশিক্ষাও সম্মানজনক হয়। নিজেদের পোশাক ছেড়ে ভুটিয়া বকু পরিধান শুরু করে।

ইংরেজ আসার পর খ্রিস্টানধর্ম বিস্তারলাভ করে এবং আধুনিক শিক্ষা পর্ব শুরু হয়। ধর্মপ্রচারের জন্যে তারা লেপচাদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করে। সেই সময় বেশ কিছু লেপচা উচ্চশিক্ষা লাভ করে।

সাধারণ শিক্ষা দেবার পর তাদের বাইবেল পড়ান হয় এবং চার্চের কর্তা করা হয়। চল্লিশটি চার্চ দেখা যায়, যা গুমফার চাইতে সংখ্যায় কম। বৌদ্ধধর্মের চেয়ে খ্রিস্টধর্মের আরাধনা পদ্ধতি সহজ। তাই এর প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। খ্রিস্টধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করে।

বর্তমানে দার্জিলিং-এর লেপচাদের উপর নেপালিদের প্রভাব সর্বাধিক। তারা নেপালি ভাষা জানে। অনেক লেপচা নিজেদের ভাষাই জানে না। নেপালি বলাই ওরা সহজ মনে করে।

লেপচারা মনে করছে তাদের সাংস্কৃতি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু নেপালি ভাবধারা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মুখে পড়েছে এই সম্প্রদায়।

নেপালিরা রাজনীতি সচেতন। যেহেতু দার্জিলিং-এ তাদের সংখ্যা বেশি তারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকেও অনুদান, অনুগ্রহ লাভ করছে। নেপালিভাষা সাহিত্য আকাদেমির স্বীকৃতি পেয়েছে ও সম্প্রতি অষ্টম তপশিলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ক্রমশ লেপচা ভাষাভাষীরা নেপালিভাষীতে পরিণত হচ্ছে। বোড়োরা যেমন বঙ্গ ও আসাম সংস্কৃতি গ্রহণ করছে তেমনি লেপচারা নেপালি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চাপে পিষ্ট হচ্ছে।

'Shezum' একমাত্র সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে লেপচা সংস্কৃতি রক্ষা করতে। গ্রামাঞ্চলে এদের কার্যক্রম বেশি। এরা ভাবছে ক্রমশ তাদের অতীতের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাকে তারা ফিরিয়ে আনতে পারবে।

লেপচা ভাষা

লেপচাদের ভাষার নাম Rongring Rong মানে লেপচা এবং তাদের ভাষা Ring বা

Aring। এই জাতির আদি ভাষার অনুসন্ধান কষ্টকর। অনেকের মতে এটি তিব্বতীয় ভাষার একটি শাখা। অনেকে বলেন 'খাসি' ভাষার সঙ্গে মিল আছে। এটিকে বলা হয় Austro-asiatic language। J.C. White বলেন, লেপচা ভাষা স্বতন্ত্র। তিব্বতির সঙ্গে কোনও মিল নেই। Hooker বলেন অনেকাংশে মিল থাকা সত্ত্বেও তিব্বতি ভাষার অংশ এটি নয়। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই ভাষা হিমালয় অঞ্চলের তিব্বতি-বর্মী বংশীয়। Robert Shafer বলেছেন নাগা ভাষার সমগোত্রীয়।

লেপচা ভাষার ইতিহাসে Mamwaring-এর অবস্থান সবচাইতে বেশি। এদের সমৃদ্ধ ও সুন্দর ভাষাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন Mamwaring এই কথা লিখেছেন 'Florence'; বলা হয় তিনি দীর্ঘকাল তাদের সঙ্গে বসবাস করেছেন এবং গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি বলেন হিবরু ও সংস্কৃতের চেয়েও প্রাচীন এই ভাষা।

দার্জিলিং-এর কাছে লেপচাদের জন্য একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন তিনি। কিন্তু তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যু লেপচাদের ভাষার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। তাদের অনেক প্রাচীন পুথি ও গ্রন্থ তিব্বতিরা ধ্বংস করে। ব্রিটিশ রাজত্বে দার্জিলিং ও সিকিমে প্রচুর সংখ্যক আবাসন ঘটে। ক্রমশ নেপালি ভাষা আধিপত্য বিস্তার করে।

বিভিন্ন দলিল মারফত জানা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে দার্জিলিং-এ লেপচা ভাষার যোগ্য মর্যাদা ছিল। ১৯২০ সাল থেকে প্রাথমিক স্তরে নেপালি ভাষার পঠন পাঠনের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। তখনই লেপচারা তাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ দেখে। তারাও দাবি জানায় প্রাথমিক স্তরে লেপচা ভাষা ঢোকানোর। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করা হয়নি। ১৯২৯ সালে Nepali Text Book Committee মন্তব্য করে—

১. যেহেতু লেপচা পাঠ্যপুস্তক নেই, তাই লেপচা ভাষা ঢোকানো সঙ্গত হবে না।
২. অধিকাংশ লেপচারা বাড়িতেই মাতৃভাষা শিক্ষা করুক।
৩. লেপচা ছাত্রদের নেপালি ও হিন্দি শিখতে হয়—তাদের জোর করে তৃতীয় একটি ভাষা শেখবার কি প্রয়োজন? বিশেষত যার কোনও সাহিত্যই নেই।

অবশেষে নেপালি ভাষাই শিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি পায়। এইভাবেই প্রাচীন একটি ভাষার কণ্ঠরোধ করা হয়।

যদিও ভারতীয় সংবিধানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় লেপচাদের শিক্ষার বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। কিন্তু তা শুধু প্রতিশ্রুতিই থেকে যায়।

এদের শিক্ষিত শ্রেণি মনস্থির করে যে কোনও ভাবে ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। ১৯৫০ সালে Lepcha Association একটি Primer প্রকাশ করে। ১৯৫৬-তে আর একটি। কলকাতার Baptist Mission Press একমাত্র ছাপাখানা যারা লেপচা ভাষায় মুদ্রণ করে। কারণ এই ভাষা ছাপান অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

এরপর সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত 'Achyuleng' মাসিক পত্রিকা। কিন্তু বেশিদিন চলেনি।

এরমধ্যে কালিম্পং-এ পারসমণি প্রধান লেপচা ভাষা ছাপানোর মুদ্রণযন্ত্র শুরু করেন। যেখানে মাসিক পত্রিকা Mutanchi ছাপা শুরু হয়। ১৯৭৫-এ বন্ধ হয়ে যায়। দু-একটি সাধারণ পত্রিকা প্রকাশ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনও প্রকাশ দেখা যায় না। বর্তমানে সিকিম থেকে প্রকাশিত হচ্ছে মাসিক পত্রিকা — 'Manyel lyang'

দীর্ঘদিন যাবৎ কালিম্পং এবং দার্জিলিং-এর লেপচা অ্যাসোসিয়েশন দাবি জানাচ্ছে লেপচা ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য, একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও আকাশবাণীতে নিয়মিত লেপচা অনুষ্ঠান প্রচার। লেপচাদের 'অধ্যয়ন সমিতি' স্থাপন প্রয়োজন যাতে লেপচা ভাষা ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

অশিক্ষা, অজ্ঞানতা এবং সংখ্যাল্পতার ফলে লেপচারা কোনও রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করতে পারেনি যাতে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবই অগ্রগতির পথে প্রধানতম বাধা।

লেপচাদের ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান

লেপচারা স্বাভাবিকভাবেই ধর্মপ্রবণ। তারা নিজেদের ঈশ্বরের সন্তান বলে মনে করে। তারা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। বলা হত তাদের নিজস্ব কোনও ধর্ম নেই। তারা আরাধনা করে পর্বত, নদী, অরণ্য অর্থাৎ তাদের চারিপাশের প্রকৃতিকে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার আগে পর্যন্ত তাদের এই বিশ্বাসই ছিল। বর্তমানে তারা তিনটি মতে বিশ্বাসী—

(১) প্রকৃতিপূজক (Animist), (২) বৌদ্ধধর্ম, (৩) খ্রিস্টধর্ম।

Tylor (18AD) প্রথম (Animism) শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

লেপচারা বিশ্বাস করে দুই শ্রেণির আত্মা আছে। এক শ্রেণি : শুভ আত্মা যারা মানুষের ভালো চায়, পশুপক্ষীর রক্ষণাবেক্ষণ করে, শস্য ফলাতে সহায়তা করে। আর এক শ্রেণির অশুভ আত্মা - যারা বিভিন্ন ক্ষতি করে। তারা ঈর্ষা জাগায়, রোগ সৃষ্টি করে, শত্রুতা বাড়ায়, মৃত্যু মহামারী আনে, শস্য নষ্ট করে অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষতি করে। অশুভ আত্মা Mong-এর পূজা করে এরা। এদের মতে শুভ আত্মা ক্ষতি করে না। অশুভ আত্মাকে তুষ্ট করা প্রয়োজন। তারা প্রতিটি পাথরে, গুল্মে, পাহাড়ে থেকে প্রতিমুহূর্তে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। সেজন্য তাদের তুষ্ট করা প্রয়োজন। এরা এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস। অন্যান্য দেবদেবীতেও। কিন্তু নিয়মিত এদের আরাধনা করে না।

লেপচা সমাজে Mun এবং Bongthing অর্থাৎ মহিলা পুরোহিত ও পুরুষ পুরোহিত আছে। লেপচা লোককথা সংগ্রহে তাদের তালিকা দেওয়া আছে। বৌদ্ধধর্মের আগমনে 'বংথিং' এর ওপর আঘাত আসে। কিন্তু মুন যথাস্থানে আছে।

তিব্বতিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। আজ তাদের জনসংখ্যার অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তিব্বত মারফত লেপচা সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম এসেছে। Gromur-এর মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে।

কর্মসংস্থান

লেপচারা শিকার নির্ভর জাতি ছিল। বিদেশিরা আসার পর কৃষিকাজে মন দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় সকলে কৃষিকাজে মন দেয়। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী লেপচারা শিক্ষিত হতে থাকে। তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে শিক্ষক, চিকিৎসক, সরকারি কর্মচারী হয়। কিন্তু বৌদ্ধ লেপচারা পিছিয়ে পড়ে। এরা নিজেদের জগৎ ছেড়ে বাইরে যেতে অনিচ্ছুক। তারা স্থায়ী কৃষিজীবী। ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ নেই। তারাও কৃষিকাজ করে। তাছাড়া এরা দরিদ্র। শহরে রেখে ছেলেমেয়েদের পড়াবার ক্ষমতা নেই।তাই যারা একটু সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবার শুধু তারাই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়। কিন্তু খ্রিস্টধর্মীদের ক্ষেত্রে মিশন থেকে সব ব্যবস্থা করা হয়। দরিদ্ররাও শিক্ষার সুযোগ পায়। এই কারণে অত্যন্ত দ্রুত ধর্মান্তরণ হয়।

দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং সিকিমের বিদ্যালয়ে নানা ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে। তিব্বতি উদ্বাস্তুদের বিদ্যালয়ে শুথু তিব্বতীয় ছেলেমেয়েরাই পড়াশোনা করে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ১৮ জন লেপচা ছাত্রের মধ্যে ১২ জনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেপালি। শুধু ১ জন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। বাকি পাঁচ জন সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করে।

গ্রামাঞ্চলে যত কম সংখ্যকই হোক লেপচারা সঙ্ঘবদ্ধ। সর্বদা স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তৎপর। কিন্তু শহরাঞ্চলে তারা সংখ্যালঘু। তাই নিজেদের গুটিয়ে রাখে।

লেপচারা স্বভাবত শান্ত ধীর স্থির। ঝগড়াঝাটি পছন্দ করে না। নেপালি ও ভূটিয়াদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। দার্জিলিং-এ এরা নেপালিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সিকিমে ভূটিয়াদের সঙ্গে।

দার্জিলিং ও সিকিমের লেপচা

দার্জিলিং-এর লেপচাদের সঙ্গে সিকিমের লেপচাদের পার্থক্য লক্ষনীয়। ১৮৩৫ সালে যখন দার্জিলিং পৃথক ভূখণ্ড হল, তখন থেকেই এই অসম অবস্থা। ব্রিটিশ সরকার দার্জিলিং-এ লেপচাদের S.T.-র অন্তর্ভুক্ত করে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য। সিকিমের লেপচারা এদের নীচু চোখে দেখতে থাকে। তাদের পদমর্যাদা বেশি যেহেতু তারা রাজার জাত।

কিন্তু তুলনামূলকভাবে দার্জিলিং-এর লেপচারা অনেক আধুনিক। কিন্তু ক্রমশ তারা নিজেদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। দার্জিলিং শহরের অনেক লেপচাই মাতৃভাষায় কথা বলে না। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কেও তারা সচেতন নয়। আচার আচরণে তারা পাশ্চাত্যের অনুকারী। সিকিমের লেপচাদের ওপর ভুটিয়া, নেপালি বা খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাব বেশি পড়েনি।

প্রথমদিকে দার্জিলিং-এ শিক্ষার সুযোগ বেশি ছিল। সিকিম থেকে দার্জিলিং-এ পড়তে আসত ওখানকার ছাত্ররা। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সিকিমে বিদ্যায়তন স্থাপিত হয়েছে। সিকিমে লেপচা ছাত্রদের মাতৃভাষা পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। রাজ্য সরকার

লেপচা ভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষার মর্যাদা দিয়েছে।

দার্জিলিং-এ লেপচা ভাষা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। ইচ্ছাকৃতভাবে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। Mamwaring লিখেছেন—সমগ্র সিকিমের মূলভাষা ছিল লেপচা। তিব্বতি, ভুটিয়া যারা এই অঞ্চলে এসেছে তারা এই ভাষায় কথা বলত।

Con-Lloyd-এর রাজত্বকালে লেপচা ভাষায় ব্যবসাবাণিজ্য চলত। আদালতে এই ভাষায় ডিক্রি জারি হত। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে হিন্দুস্থানী ভাষার ব্যবহার শুরু হল। তাকেই মূল ভাষার মর্যাদা দেওয়া হল।

বর্তমানে অন্তত প্রাথমিক স্তরে লেপচা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু যেহেতু কলকাতা থেকে অনেক দূরে, তাদের দাবিদাওয়া এরা পৌঁছে দিতে পারছে না। সিকিমের ভারতভুক্তির পর থেকে জাগরণ শুরু হয়। নানা রাজনৈতিক আন্দোলনে এরা অংশগ্রহণ করে। সচেতনতা বাড়ে। বর্তমানে বিধানসভায় এদের প্রতিনিধি রয়েছে।

কিন্তু দার্জিলিং-এর লেপচাদের মধ্য হতে একজনও আজ পর্যন্ত বিধানসভা, লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্য হতে পারে নি।

সমাজের বৃহত্তর অংশের গ্রাসে চলে যেতে যাতে না হয় সেজন্যে দার্জিলিং-এর লেপচারা সচেষ্ট। তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে, যথাযোগ্য স্বীকৃতি আদায়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

১৯২৯ সালে এরা একটি সংগঠন করে Shezum নামে। সিকিমের লেপচাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার ভয় নেই। তারা অনেক পরে সংগঠন করে।

চাকরির ক্ষেত্রে সিকিমের লেপচারা সুযোগ বেশি পায়। এদের শতকরা জনসংখ্যার হার ১০.৬৩। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বনবিভাগের অধিকর্তা ইত্যাদি চাকরি পায়। কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে দার্জিলিং-এর লেপচারা আজও বঞ্চিত, অবহেলিত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে।

পরিবার

বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসের ইচ্ছা দেখা দিলেও একান্নবর্তী পরিবারের প্রতি এদের আগ্রহ বেশি। এক সঙ্গে অনেকে বসবাস করা পছন্দ করে। একান্নবর্তী পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী-কন্যা এবং ঠাকুমা বোঝায়। অনেকসময় ঠাকুমার ভাই বোনরাও থাকে। স্বামী-স্ত্রী একইভাবে ঘর ও বাইরের কাজ করে। মা এবং বাবা উভয়েই বাড়ির কর্তা। মহিলা পুরোহিত Mun-এর আধিপত্য পুরুষ পুরোহিত Bongthing-এর চেয়ে বেশি। এতে মনে করা যেতে পারে একসময় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল এদের।

তথ্যসূত্র :

1. G.B. Mainwaring - A Gramar of Rong
2. R.N. Thakur - Himalayan Lepchas

3. J.D. Hooker - Himalayan Journals
4. K.P. Tamsang
5. Dugey Lepcha
6. Lepcha - My Vanishing Tribe - A.R. Foning
7. বিস্তীর্ণ লেপচা গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত্র সমীক্ষা।